৬) ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রটি আলোচনা কর।

→ ট্র্যাজেডির উপাদান প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল বলেছেন, তার মধ্যে প্রথম স্থান প্লটের, তারপরে চরিত্রের। চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনী আদি মধ্য দিয়ে পৌঁছায় পরিনামের দিকে। মধ্যযুগীয় সাহিত্য সৃষ্টিতে টাইপ চরিত্র নির্মানই প্রাধান্য পায়, সেই রকম ভাঁড়ু দত্ত একটি টাইপ চরিত্র হলেও তার মধ্য দিয়ে মুকুন্দরাম স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন।

মনুষ্য চরিত্রগুলির মধ্যে খল চরিত্রগুলি রূপায়নেই কবি অসাধারন নৈপুন্যের পরিচয় দিয়েছেন। যার মধ্যে ভাঁড়ু দত্ত চরিত্র বিশেষ উজ্জ্বল। কবিকঙ্কন তাঁর কাব্যে আখেটিক খণ্ডে কালকেতুকে নায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিলেও কার্যত ভাঁড়ু দত্তকে আকর্ষনীয় চরিত্র হিসাবে অঙ্কন করেছেন। এই প্রসঙ্গে ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র বৈশিষ্ট্য-গুলি নীচে আলোচনা করা হল।

P.T.O

ভাঁড়ুদত্ত নির্লজ্জ স্তাবক। তার এই স্বার্থমুখী স্তাবকতা তাকে হাস্যরসিক ভাঁড়ে পরিণত করেছে। দুর্দশাগ্রস্ত কলিঙ্গ প্রজাদের সঙ্গে না এসে, আসে পৃথক ভাবে আলাদা উপঢৌকন নিয়ে, রাজা কালকেতুর জীবনে এক দুষ্টগ্রহের মতো আবির্ভূত হয় ভাঁড়ু দত্ত। রাজসভায় তার আগমন বেশ কৌতুকপূর্ণ —

"ভেট লয়্যা কাঁচকলা   পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগে ভাঁড়ুদত্তের পয়ান।
ভালে ফোঁটা মহাদম্ভ   ছেঁড়া ধুতি কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরশান॥"

ভাঁড়ুদত্ত নিজের পরিচয় দিয়ে রাজা কালকেতুকে বলেছে —

"কহি যে আপন তত্ত্ব   আমল হাতার দত্ত
তিনকুলে আমার মিলন।
দুই নারী মোর ধন্যা   ঘোষ বসুর কন্যা
মিত্রে কৈল কন্যা-সমর্পণ॥"

ভাঁড়ু দত্ত বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী, তাই সে কালকেতুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য 'খুড়া' সম্বোধন করেছে। অধিকার পাওয়ার জন্য খোসামোদ করতে গিয়ে সে হিতাকাঙ্ক্ষী সাজতে চায় রাজার। সে রাজাকে বলেছে —

"দেহ মোরে সর্বভার   তাড়বালা আদি যার
তুমি থাক নিশ্চিন্তে নিলয়।"

ভাঁড়ু দত্ত ছিল লোভী প্রকৃতির, তাই সে রাজা কালকেতুর কাছ থেকে সম্মান লাভের জন্য বলেছে —

"আমি পাত্র রাজা তুমি   আগে পূজা পাব আমি
পরিণামে ভাঁড়ুরে জানিবে।"

স্বার্থপর ব্যক্তিমাত্রেই পরশ্রীকাতর হয়, এই সূত্রেই বুলান মন্ডলের প্রতি ভাঁড়ু দত্তের হিংসা ও ঈর্ষা, রাজার কাছে বুলান মন্ডলের আধিপত্য ও সমাদর কিছুতেই সে তা স্বীকার করতে পারেনি। তাই তার বিরুদ্ধে ভাঁড়ু তার পূর্বের দারিদ্র্য ইঙ্গিত করে রাজাকে ব্যঙ্গপূর্ণ ভাষায় বলেছে —

"দেওয়ান ভেড়ুর বেটা   বহিত আমার চিঠা
মারে বল বুলান মন্ডল।"

উগ্র অর্থলিপ্সা তার সমস্ত কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ করেছে। রাজার কাছে ক্ষমতা পেয়ে সে প্রজাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেছে। তাই হাটুরিয়ারা রাজার কাছে আবেদন করেছে —

" মহাবীর রাজা কর ভাঁড়ু দত্ত লম্ফা।
হের দেখ পিঠে চুন   ভাঁড়ু দত্ত করে খুন
সবে যায় কিমায় হইয়া ॥"

ভাঁড়ু-চরিত্রে প্রতিহিংসা-প্রবণতা একে জটিল চক্রান্ত ও কৌশল-পরায়ণ করে তুলেছে। সে ভদ্রতার মুখোশ খুলে রাজার পূর্ব-বৃত্তান্ত তুলে ব্যঙ্গ করে বলে—

"যেখানে আমার খুড়া মুচালে মাশুলী,
দেখিয়াছি খুড়া হে তোমার ঠাকুরালী ॥"

ভাঁড়ুর কপটতার জন্য রাজা কালকেতু কলিঙ্গরাজের নিকট বন্দী হয়, তবে দেবী চন্ডীর আনুকূল্যে কালকেতুর জয় হয় এবং কলিঙ্গরাজের নিকট তার রাজসম্মান প্রত্যক্ষ করে ভাঁড়ু তার রণনীতি পরিবর্তন করে বলেছে —

" তুমি খুড়া হৈলে বন্দী   অনুক্ষণ আমি কান্দি
বহু তোমার নাহি খায়ভাত,"

এখানে তার অভিনয়-পটুতা, ছলনা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। কিন্তু এদিয়ে শেষ রক্ষা হল না ভাঁড়ুর। তার চরিত্রের খলতা, কপটতা আর অজানা নেই কালকেতুর। তাই বলেছে —

"কহিতে জানিস যেটা কপট প্রবন্ধ।
হৃদয়ে প্রকৃতি বিষ মুখে মকরন্দ॥"

এতে ভাঁড়ুর পরিণতি দুঃখান্তিক হয়ে ওঠে। নাপিতের ক্ষুরে রক্তপাত হতে থাকলে সে রাজার কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং শেষপর্যন্ত —

"ভাঁড়ুর সাধনে বীর দুঃখ ভাবে বড়ি
কৃপা করি পুনর্বার দিল ঘরবাড়ি।"

অবশেষে বলা যেতে পারে ভাঁড়ুর খলতা কোনও দিক থেকেই দৈবী প্রভাবের অংশে যুক্ত নয় বলেই একটি মানবিক তাৎপর্য পেয়েছে, আর তার ফলে সে হয়ে উঠেছে চণ্ডীমঙ্গলের সার্থকতম সৃষ্টি? ড. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের মতে বলা যেতে পারে ——

"চণ্ডীমঙ্গলের ভাঁড়ু দত্তের মত এরূপ জীবন্ত চরিত্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে কোথাও মিলে না। ...."

(কবিকঙ্কন চণ্ডীর ভূমিকা, পৃ: ৫৫)